International Bilingual Journal of Culture, Anthropology and Linguistics (IBJCAL), eISSN: 2582-4716
https://www.indianadibasi.com/journal/index.php/ibjcal/issue/view/1
VOLUME-1, ISSUE-1, ibjcal2019J05, PP. 39-54

IBJCAL
International Bilingual Journal of Culture, Anthropology and Linguistics
ইন্টারন্যাশনাল বাইলিঙ্গুয়াল জার্নাল অফ কালচার, অ্যানথ্রোপলজি অ্যাণ্ড লিঙ্গুইস্টিক্স্
eISSN: 2582-4716

উত্তরবঙ্গের মেচ (বোডো) জনজাতির জনজীবন: খণ্ড দিয়ে অখণ্ডের নির্মাণ

Uttarbanger Mech (Bodo) Janajatir Janajiban: Khanda Diye Akhander Nirman

প্রদীপ রায়; বাংলা (পিএইচডি), বাংলা বিভাগ; যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

ARTICLE INFO

Article history:
Received 25/06/2019
Received (revised form) NA
Accepted

Keywords:
মেচ জনজাতি,
মেচ জনজীবন,
উত্তরবঙ্গের মেচ,
উত্তরবঙ্গের বোডো,
বোডো জনজাতি,
বোডো জনজীবন,
উত্তরবঙ্গের জনজাতি,
উত্তরবঙ্গের জনজীবন।

ABSTRACT

উত্তরবঙ্গের অন্যান্য জনজাতির মতো মেচরাও মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে ছোটো বড়ো নদ নদী খাল বিল ও নিবিড় অরণ্যের কোলে একসঙ্গে দলবদ্ধ ভাবে থাকতে ভালবাসে। এই জনগোষ্ঠীর মানুষেরা বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন নামে পরিচিত। উত্তরবঙ্গ, নেপাল, কাশ্মীর উপত্যকার অধিবাসী বোডোগণ মেচী নদীর নাম অনুযায়ী মেচ বা মেচে নামে পরিচিত। আবার সংকোশ নদী থেকে পূর্বে ব্রহ্মপুত্র বা বরাক উপত্যকায় তাদেরকে বোডো (Bodo) বলা হয়। এছাড়া কাছাড় পর্বতের জনজাতিদের বোডো-কছারী ত্রিপুরায় বসবাসকারী মেচদের ত্রিপুরী বা কোক্‌বোডো ডিমাপুরের বাসিন্দাদের ডিমাস বোডো মণিপুরে বসবাসকারী মেচরা মণিপুরীবোডো নামে পরিচিত। এই জনজাতির প্রধান জীবিকা কৃষিকাজ। লাঙ্গল ও বলদ দিয়ে বিভিন্ন ধরনের ফসলের চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করে। মেচদের সামাজিক রীতি নীতি সহজ সরল আর মেচরা আমোদ প্রিয় ও রসিক প্রকৃতির। প্রকৃতিকে তারা নারী জ্ঞানে পূজা ও রক্ষণাবেক্ষণ করে। সুখ দুঃখ প্রেম ভালোবাসায় তারা প্রকৃতিকেও অংশিদার করে তোলে। তবে তারা শুচি অশুচি ব্যপারটি কঠোর ভাবে মান্য করে। বিভিন্ন প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে দিয়ে তারা জীবন অতিবাহিত করলেও বছরের নির্দিষ্ট সময় পূজা পার্বন, শিকার, উৎসবে নাচ গান করে আনন্দ উপভোগ করেন। মেচ জনজাতি তাদের ঘর গুলি বাঁশ, বেত, ছন, ওডলার ছাল ও বিভিন্ন গাছের পাতা দিয়ে তৈরি করে। আজ বোডো বা মেচ জনজাতি তপসিলি উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত, সংখ্যালঘু ও প্রান্তিক। বিশ্বায়ন ও নাগরিক সভ্যতার ভাবে ও প্রভাবে তাদের সমাজ ও সংস্কৃতি আজ অস্তিত্বের সংকটে।

১.০ সূচনা

প্রবন্ধের শিরোনামে খণ্ড ভূমি 'উত্তরবঙ্গের' নাম শুনে কোন কোন পাঠক প্রশ্ন তুলতেই পারেন, ধ্যাৎ তেরিকা! জনজাতিকেও দেখছি এবার প্যাকেট জাত করে বাজারে ছাড়ার কৌশল। মাপ করবেন, সবিনয়ে নিবেদন করছি — সে রকম কোন ফন্দি আমরা এটে বসিনি, না না রাজনৈতিক কোন উদ্দেশ্যও নেই। এই তো মশাই! এর মধ্যেই আবার রাজনৈতিক গন্ধ পেলেন। আর পেলেও কী করব বলুন। আপনার দোষ নয়, বাঙালির নাকের দোষ। আর নাকেরি বা

কী দোষ বলুন, আপনাদের দৃষ্টিভঙ্গি, আপনদের অহংকার, আমিত্ব বোধ, উচু জাতের বড়াই, আপনাদের সুযোগ সন্ধানী মানুষিকতা থেকে এক চুল সড়ে এসে কী কোন দিন ভেবেছেন — তোমাদের চোখে যারা অসভ্য, উপজাতি, বর্বর মানুষদের কথা। দিয়েছেন কী কোনদিন তাঁদের সভ্য হওয়ার সুযোগটুকু। বুকে হাত দিয়ে নিজেকে প্রশ্ন করুন, ভিতর থেকে চাঁপা উত্তর আসছে — দেন নি। শুনেছেন কি কখনও তাঁদের সুখ দুঃখের কথা। জঙ্গলা উত্তরবঙ্গে তারা কীভাবে বেঁচে বর্তে থাকে তার খোঁজও রাখেনা সভ্য বাবুরা। রাজনৈতিক নেতাদের দেখা পাবেন ভোটের আগে তীর্থের কাকের মতো। কান ফাটানো আওয়াজে শুনতে পাবেন মেকি অভেদের কথা, মুখ রোচক বুলি। না, সেই মেকি অভেত, মিথ্যে অখণ্ডের প্রতি জনজাতিদের আর বোধহয় আস্থা নেই। সম্মিলিত জনজাতিদের ছলনাহীন খণ্ড স্বপ্নগুলি হয়তো একদিন হয়ে উঠবে অখণ্ড ভারতের মূল মন্ত্র। খণ্ড উত্তরবঙ্গের মেচ জনজাতিদের নিয়ে কথা বলতে গেলে একথাগুলি খুব বেশি বেশি করে মনে পড়ে যেন। যাই হোক, এবার মূল কথায় আসা যাক।

২.০ ভৌগলিক অবস্থান

উত্তরবঙ্গের অন্যান্য জনজাতির মতো মেচরাও মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে ছোটো বড়ো নদ নদী খাল বিল ও নিবিড় অরণ্যের কোলে একসঙ্গে দলবদ্ধ ভাবে থাকতে ভালবাসে। এই জনগোষ্ঠীর মানুষেরা বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন নামে পরিচিত। উত্তরবঙ্গ, নেপাল, কাশ্মীর উপত্যকার অধিবাসী বোডোগণ মেচী নদীর নাম অনুযায়ী *মেচ* বা *মেচে* নামে পরিচিত। আবার সংকোশ নদী থেকে পূর্বে ব্রহ্মপুত্র বা বরাক উপত্যকায় তাদেরকে বোডো (Bodo) বলা হয়। এছাড়া কাছাড় পর্বতের জনজাতিদের *বোডো-কছারী* ত্রিপুরায় বসবাসকারী মেচদের *ত্রিপুরী* বা *কোক্‌বোডো* ডিমাপুরের বাসিন্দাদের *ডিমাস বোডো* মণিপুরে বসবাসকারী মেচরা *মণিপুরীবোডো* নামে পরিচিত।[১] প্রাচীন ইতিহাস, গবেষক ও মানববিজ্ঞানীগন এই জনজাতিকে *ইন্দো-মঙ্গোলীয় বড়* জাতির বংশধর বলে মনে করেন।[২] বড় জাতীর নাম থেকেই বোডো (বড়>বড্ড>বড়ো>বোড়ো) জাতির নামকরণ এসেছে। এই মঙ্গোলীয় মেচরা ভারতে কবে কী ভাবে কেন এসেছিল ইতিহাসে সেভাবে তাদের নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় না। কারণ তারা ভারতে আসার সময় এদেশে ইতিহাস লেখার সাধ্য ও সাধনা কোনটিই ছিল না বা বলা ভালো প্রচলন ছিল না। তবে মনে করা হয় মধ্য এশিয়ার মঙ্গল-চীন দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে এই মঙ্গোলীয় বড় জাতির মানুষ আহার, বিহার, পানীয়, বাসস্থান ও নিরাপত্তার অভাব বোধ করে এবং তারা সুস্থ সুন্দর শান্তিপূর্ণ মনোরম বাসস্থানের সন্ধানে চারদিকে বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ে।[৩] এই জনজাতিরই একটি শাখা এক সময় হিমালয়ের উত্তর-পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিম গিরিপথ দিয়ে ভারতে প্রবেশ করেন। অনেকেই হিমালয়ের নিচে সমতল ও উর্বর জমিতে কৃষিকাজ করার জন্য বসবাস শুরু করেন।

এইভাবেই মঙ্গোলীয় বোডোগণ বা মেচরা শস্য শ্যামলা সজীব লাবণ্যময়ী প্রকৃতির কোলে বসবাস শুরু করে ক্রমে সাম্রাজ্য স্থাপন এবং নিজস্ব সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রচলন করেন। উত্তর-পূর্ব গিরিপথ দিয়ে আসা বোডোগণ উত্তর-পূর্ব ভারতে এবং উত্তর-পশ্চিম গিরিপথ দিয়ে আসা বোডোগণ উত্তরভারতে বসবাস ও পরে শাসন ক্ষমতায় এসেছিলেন। এদেশের বিভিন্ন রাজ্যে মঙ্গোলীয় রাজারা রাজত্ব করেছিলেন। যেমন— কামরূপ বা কামাখ্যার রাজা নরক বা নরকাসুর, শোনিতপুরের বাণ রাজা বা বাণেশ্বর, কামরূপ-কামতাপুরের রাজা খাণ্ডা বা কান্তনাথ (ইনি পরে নীলধ্বজ নাম গ্রহন করেন), কোচবিহারের রাজা কুচুহাং (সিন্ধু প্রদেশ থেকে এসে কোচবিহারে পুনঃ রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন) নরনারায়ণ, জলপাইগুড়ির পৃথ্বীরাজ চৌহান, চিকনারাজ হাওরীয়া মেচ (হারীয়ার মণ্ডল),জম্মু-কাশ্মীরের রাজা হরিসিং মেচ, কামরূপের সমুদ্রবর্মা, বলবর্মা, ভাস্করবর্মা, ব্রহ্মপাল, রত্নসিংহ, ধর্মপাল, দরংরাজ আরিমও, ডিমাপুর রাজ্যের রাজা মাইরং বা মহিরঙ্গ প্রমুখ।[৪] কিন্তু কালের নিয়মে মঙ্গোলীয় সাম্রাজ্যও ধবংস হয়ে যায়। আজ বোডো বা মেচ জনজাতি তপসিলি উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত, সংখ্যালঘু ও প্রান্তিক। বিশ্বায়ন ও নাগরিক সভ্যতার ভাবে ও প্রভাবে তাদের সমাজ ও সংস্কৃতি আজ অস্তিত্বের সংকটে।

৩.০ পেশা, ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচার বিধি

এই জনজাতির প্রধান জীবিকা কৃষিকাজ। লাঙ্গল ও বলদ দিয়ে বিভিন্ন ধরনের ফসলের চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করে। তবে বর্তমানে আধুনিক পদ্ধতিতে বিভিন্ন রকমের ধান ও রবি শস্যের চাষ করছে। মেচ জনজাতি সৎ- সরল ও কঠিন পরিশ্রমী। চাষের কাজে পুরুষের পাশাপাশি মেয়েরাও অংশগ্রহণ করে। মেচ রমণীগণ এণ্ডি চাষ ও তাঁত শিল্পেও বেশ দক্ষ। এণ্ডি পোকার গুটি থেকে সুতা তৈরি করে তারা নানা ধরনের সুন্দর সুন্দর বস্ত্র (দোখ্না, চাদর, ফাস্রা, লিংটি, মাফলার) তৈরি করে।[৫] মেচদের কুলদেবতা হল *বাথৌ*, এটি অনেক প্রাচীন ধর্ম। এই ধর্ম পালনের সঙ্গে আছে তাঁদের নিজস্ব দর্শন। বাড়ির উঠনে উত্তর-পূর্ব কোণে মাটির বেদির উপরে পঞ্চডাল বিশিষ্ট সিজু গাছ লাগানো হয়। *বাথৌ* পঞ্চদেবতা রূপে পূজিত হয়। *বাথৌ* শব্দের অর্থ হল পঞ্চ বা পাচ। এই পাঁচ হল মৃত্তিকা, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ। মেচ ভাষায় বলে হা, দৈ, অর, বার, অখৌরাং।[৬] *বাথৌ* ধর্মের উদ্দ্যেশ্য হল এই পাঁচটি শক্তির স্বরূপ অনুসন্ধান করা। বৃদ্ধ *বাথৌ* একাধারে হিন্দুদের ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর। এছাড়া আরো দেবদেবীর কল্পনা করা হয়েছে। *বাথৌ* ধর্ম পালনের নীতিগুলি হল –ভগবানের সেবা করা, সমাজে দান দক্ষিণা করা, কোন জীব জন্তুকে ছোটো না করা। এঁরা নিরাকার ভগবানে বিশ্বাসী হলেও নানা দেবদেবীর পূজা করেন। ১লা বৈশাখ থেকে *বাথৌ* দেবতার সঙ্গে অন্যান্য দেবদেবীর পূজা করা হয়। আসামের বিহু উৎসবের মত মেচ জনজাতি ১লা বৈশাখ থেকে ৭ দিন বৈশাখ উৎসব করে। '*বাথৌ*' দেবতাকে অনেকে শিব জ্ঞানেও পূজা করে। স্ত্রী দেবতা রূপে তারা মাইনাও বুড়ির পূজা করে। মাইনাও দেবতার বেদী উত্তরের রান্না ঘরের উত্তর -পূর্ব কোণে রাখা হয়। *মাইনাও* কে তারা লক্ষ্মীর মত সম্পদের দেবতা বলে মনে করেন। এছাড়া আছে মহাকালের অনুচর; মানাসু, সানজান, ব্রালি, আরাং, খোইটা প্রভৃতি দেবদেবী- এরা সকলেই নদী বিষয়ক দেবতা। ধরিত্রী মাতাকে উগসর্গ করে তারা *থানসিরি* নামে ভূমিপূজো করে। গ্রামের সকলের শুভ কামনা করে *রোজা* বা পুরোহিত এই পূজানুষ্ঠান করে। পূজার উপকরণ হিসেবে তারা পাকাকলা, দুধ, চিঁড়ে, আতপচাল ব্যবহার করে। বলি প্রথায় (মোরগ, মুরগি, পায়রা, শূকোড়) পূজা করার রীতি প্রচলিত আছে। তিস্তা বুড়ির পূজায় ছাগলি এবং থানসিরি পূজায় ছাগল লাগে। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে এই পূজা হয়। আষাঢ়ে হয় মনসা পূজা। এই পূজায় ছাগল, বকরি ও শূকর বলি দেওয়া হয়। আশ্বিন মাসে হয় মূর্তিহীন দুর্গাপূজা। ছেলেরা পাড়ায় পাড়ায় মাগন করে অর্থ সংগ্রহ করে। একে বলে *বাকখেলা* । মাসের শেষ দিন দেবী পূজা হয়। কার্তিক মাসে অনুষ্ঠিত হয় *চো-গেলে নাই* উৎসব। এটা এক ধরনের মুখোশ নৃত্য। পৌষ মাসে হয় *হাগরা মাদাই* পূজা।[৭] এই জনজাতির মানুষেরা যাতে বনে তাদের গৃহপালিত পশু নির্ভয়ে চরাতে পারে, বনের হিংস্র জন্তুর হাত থেকে রক্ষা পায় সেই কামনায় তারা এই দেবতার পূজা করে। রাজবংশী সম্প্রদায়ের পশু বিষয়ক দেবতা গোরক্ষনাথ ও সোনারায় দেবতার সঙ্গে *হাগ্রা মাদাই* দেবতার পূজাকরার উদ্দেশ্য যেন এক ও অভিন্ন। প্রত্যেক দেবতার সঙ্গে রক্ষা করার বিষয়টি যুক্ত। এই দেবতার পূজাগুলি তারা গৃহ পালিত পশু ও প্রাকৃতিক সম্পদের প্রতি ঐকান্তিক ভালবাসা বোধ থেকে করে। অনেকে অরণ্যের দেবতা রূপেও পূজা করে থাকে। গানের মাধ্যমে তাঁরা দেবতার কাছে তাঁদের আবেদনের কথা জানায় —

মোসুয়া নাজা অরনাই ননা,
ছাইমা হাগরা অরনাই ননা
জাংনন্ খিন্দা হরবলা।
মাসাউ দাম্রা বেহের জংগোন,
দাম্রিয়া জলই ফেহের গন্
লওখের গথ্জং গৌগগম্
বেংগম জং-নন্ খিন্দা হরবলা।[৮]

বাংলায় অনুবাদঃ

রাখাল বালকেরা দেবতার কাছে পশু পাখির শুভ কামনার জন্য প্রার্থনা করে, যেন তাদের গৃহপালিত পশুর অসুখ না হয়। বাঘ, শেয়ালে যেন তাদের নিয়ে যেতে না পারে ও সুষ্ঠু ভাবে বংশ বৃদ্ধি করতে পারে।

এই সব গানের মধ্যে দিয়ে সহজ সরল আদিবাসিদের মধ্যে পশু পাখি ও প্রাকৃতিক সম্পদের প্রতি ভালোবাসা ও তা রক্ষা করার দায়িত্ববোধ লক্ষ্য করার মত। প্রাকৃতিক বিপর্যয়, বন্যা, খরা, ভূমিকম্প, বজ্রাঘাতে মানুষ ও গবাদি পশু যাতে নিরাপদে থাকতে পারে সেজন্য তারা চৈত্র মাসে *গামি পূজা* করে। এই সব গান ও লোকাচারের মধ্যে দিয়ে মেচ জনজাতির আদিম অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও পেশা সম্পর্কে জানা যায়। প্রাচীন কালে এঁরাও যে পশু শিকার ও পশুপালন করত তা এই সব গানের মধ্যে দিয়ে বোঝা যায়। *বাথৌ* ধর্ম মেচদের প্রাচীন ও কৌলিক ধর্ম হলেও বর্তমানে নানা ধরনের ধর্মে (ব্রাহ্ম ধর্ম, খ্রিস্টধর্ম) ধর্মান্তরিত হচ্ছে। এই সব ধর্মের প্রভাবে তাদের নিজস্ব আচার ও সংস্কৃতি বিলুপ্তির পথে এগিয়ে যাচ্ছে।

মেচদের সামাজিক রীতি নীতি সহজ ও সরল প্রকৃতির। প্রকৃতিকে তারা নারী জ্ঞানে পূজা ও রক্ষণাবেক্ষণ করে। সুখ দুঃখ প্রেম ভালোবাসায় তারা প্রকৃতিকেও অংশিদার করে তোলে। তবে তারা শুচি অশুচি ব্যপারটি কঠোর ভাবে মান্য করে। ব্যভিচার বা যে কোন অন্যায় কাজ করলে সমাজে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা আছে। এই কারণে মেচরা নিজেদের জন্ম শুদ্ধ জাত ভাবে। মেচরা তাদের নামের পরে বিভিন্ন ধরনের পদবি ব্যবহার করে। যেমন- বসুমাতারি, চম্প্রমারি, মোছারি, ঈশ্বরারি, হাজোয়ারি, দৈমারি প্রভৃতি।[৯] তারা এই সব বিভিন্ন উপাধি ব্যবহার করলেও সমাজে শ্রেণি বা বর্ণ বিভেদ নেই। যে কোন ব্যক্তি রোজা বা পুরোহিতের কাজ করতে পারে। মেচদের ধর্মীয় উৎসবের মধ্যে কেরাই পূজার উৎসবই শ্রেষ্ঠ। কেরাই পূজা তিন রকমের হয়। যেমন— আই কেরাই, মাড়াই কেরাই, ও গার্জা কেরাই। গার্জা কেরাই সকলে মিলে সম্মিলিত ভাবে করে। তবে বর্তমানে সে রকম ভাবে এই উৎসবটি দেখা যায় না।

৪.০ মেচদের নৃত্যগীত ও আমোদ উৎসব :

মেচ জনজাতি সহজ সরল আমোদ প্রিয় ও রসিক প্রকৃতির। বিভিন্ন প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে দিয়ে তারা জীবন অতিবাহিত করলেও বছরের নির্দিষ্ট সময় পূজা পার্বন, শিকার, উৎসবে নাচ গান করে আনন্দ উপভোগ করেন। নতুন বছর বরণ করার জন্য তারা আনন্দ উৎসবে মেতে ওঠেন। নববর্ষের সময় প্রথম *বাথৌ* ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়। *বাথৌ* ধর্ম গ্রহণ করে এই জনজাতির মানুষ সমাজে সভ্য ও শ্রেষ্ঠ জীবের মর্যাদায় ভূষিত হয়। বোডো জনজাতিও এই সময় নববর্ষ পালন করেন। মেচদের সমাজে নানা ধরনের নৃত্য প্রচলিত আছে। নববর্ষ বরণ করার জন্য তারা *বেনেগু নৃত্য* করে। নতুন বছর শুরু হওয়ার দশ বার দিন আগে থেকেই এই নৃত্যের আসর আনন্দ মুখর হয়ে ওঠে। এই নৃত্যে নারী পুরুষ সবাই মিলিত ভাবে অংশগ্রহণ করে গান গেয়ে বিভিন্ন গ্রামে ঘুরে বেড়ায়। বৈশাগু উৎসবকে মানব ও প্রকৃতির উর্বরতার অনুষ্ঠান বলে অনেকে মনে করেন। বৈশাগু উৎসব উপলক্ষ্যে তাঁদের গান এরকম —

গান:

নৈ ফাইলায় রায় সফাইলায় রায়
বৈ শাগু বৌ থৌরা স কৈ লায় বায়
বাগুরুম বাগুরুম মৌসাদৌলায়
দাগুরুম দা দা দাগুরুম দা
খাম রিংখাং নাইযাও
টিং টো টিং টো যথানি ভেং খৌয়াও
রৌংজানায় বৌ থৌবা সফাঈলায় বায়
দে মৌসাল দে রৌংজা ছে
বাগুরুম বাগুরুম মৌসাদে

বৈশাগু বৌথৌরাও জৌহৌলাও সিখলা রোংজা দে।[১০]

বাংলা:

ঐ এল যে এসেই গেল
নতুন বছর বৈশাখের দিন।
আনন্দে মাতোরে নৃত্যের ছন্দের হিন্দলে
এল বৈশাগু উৎসবের দিন
ঢোল করতালের তালে
মাতো নৃত্যে গীতে
মাতোরে পুরুষ মাতোরে নারী
এই আনন্দ ঘন নৃত্য ও গীতে।

এভাবে নববর্ষারম্ভে ঢোল করতালের সম্মিলিত ধবনিতে সহজ সরল ভাষায় তারা তাঁদের মনের প্রেম- বেদনা, দুঃখ- আনন্দ ঘন ভাব প্রকাশ করেন। এই জনজাতির মধ্যে শ্রম ও কর্ম ভিত্তিক কয়েকটি নৃত্যের প্রচলন আছে। কর্ম জীবনকে ভালোবেসে তারা কাজের মধ্যে দিয়ে আনন্দ লাভ করার জন্য এই সব নৃত্য করেন। গভীর বনে কাঠ কাটতে যাওয়ার নৃত্য হল *বিং ফাং বাদারী* আর ধানের ক্ষেতে ধান রোপণের সময় *মায় গায় নায়* নৃত্য করেন। প্রকৃতির দেবতাকে খুশি করার জন্য তারা এসব নৃত্য করেন। *বিং ফাং বাদারী* নৃত্যে বনের কাঠ নিরাপদে সংগ্রহ করা ও *মায় গয়া নায়* নৃত্যে ফসল ভালো হওয়ার ও রক্ষা করার আবেদন থাকে। প্রকৃতির প্রতি ঐকান্তিক ভালোবাসা বোধ ও প্রাকৃতিক সম্পদকে রক্ষা করার জন্য তারা প্রকৃতি বিষয়ক নানা নাচ গানের আয়োজন করেন। যেমন- *ডেওলী বৌন্ নায়* - এই নৃত্যে প্রজাপতির রঙিন পাখনার আকারে শরীরে দুটি পাখনা বেঁধে নাচা হয়। এই নৃত্যগুলির উদ্দেশ্য হল মানুষের মনে প্রকৃতি ও জীবজন্তুর প্রতি সৌন্দর্য বোধ সৃষ্টি করা। *ন্যাওলায় মৌশানায়* নৃত্যে দুটি গোসাপের যুদ্ধ দেখান হয়।

মেচ জনজাতির ধর্মীয় নৃত্যের মধ্যে জনপ্রিয় *মাইনাও* (গৃহদেবী) পূজা উপলক্ষ্যে হয় *বরায় নায়* নৃত্য । গৃহের শুভ কামনা ও ফসলের দেবীকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে এ নৃত্য করা হয়। *থৈ জুমা হৌনায়* নৃত্যে বৌ দেবতার প্রতীক মিজ মনসার বৃক্ষকে আরাধনা করার দৃশ্য দেখান হয়। *দাও থুইন্ লৌঙ নায়* হল মোরগ বলি দিয়ে তার রক্ত বাটিতে ধরে বা বৌ দেবতাকে নিবেদনের নৃত্য। এঁরা এক হাতে ঢাল ও অন্যহাতে খরশান তরবারি নিয়ে রণনৃত্য করে, একে বলে *ঢাল-থুংরী মৌলানায়* । দু হাতে খোলা তরবারি নিয়ে যে যুদ্ধ নৃত্যটি করা হয়, তার নাম *সত্রালী* । এই রণ নৃত্যগুলির মধ্যে দিয়ে অতীত দিনের যুদ্ধের দৃশ্যগুলি শিল্পসম্মত ভাবে দেখান হয়।

মেচ জনজাতির সব থেকে জনপ্রিয় দৃষ্টি নন্দন নৃত্য হল *বাগুরুম্বা* । বসন্তকালে *বসন্ত উৎসব* উপলক্ষ্যে এই নৃত্যগীত হয়। *বাগুরুম্বা* পঞ্চম তালের নৃত্য। বসন্ত আগমনে যুবতীর হৃদয়ের আনন্দ ঘন প্রেম নৃত্যগীতের মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হয়। নৃত্যটি সঙ্গীত নির্ভর, *বাগুরুম্বা* নৃত্যের সঙ্গীত নিম্নরূপ —

মেচ ভাষায়:

বা বা বা বাগুরুম্বা ।।

দৈ জিরি জিরি মামু খিংখিরি
সোনানি জিনজিরি হায় জিনজিরি।।
সবান লঙআ ব্লা জুলি লঙআ ব্লা
থাব বৌ রৌম হোমনানৈ বাম না নৈ লাগৌমইন
দা আং লাগৌমইন দা।।
থুরি বারিনি লায় দাওছেন
সো মৌ হৌমীর লা নৈ মৌসাদে
হায় রৌং জাদে।।[১১]

বাংলায় অনুবাদ:

এসো সখিরা এসো এসো তালে তালে
ছন্দে ছন্দে সবাই মিলে নাচি।
ঝর্ণায় স্রোতের দোলায় ছোটো ছোটো
শামুকের মালা যেমন বাজে
নৃত্যের দোলায় তেমনি বাজে
আমাদের সোনার হার।
হায় যদি না থাকত কুলের বাধা
তোমায় নিতাম আপন করে হে কোলে সখা।
ওগো তৃণ বনের রঙিন পাখিটি
এসো গো সখা এসো গো সখিরা
আনন্দেতে সবাই মিলে নাচি।

মেচ রমণীরা বসন্তকালীন এসব নৃত্যের মধ্যে দিয়ে নিজেদের প্রকৃতির কাছে মেলে ধরার সুযোগ পায়। শামুখের খোলের ভিতরে কুলের বাঁধায় আবদ্ধ না থেকে ঝর্ণার ধারার মত সমস্ত বাঁধা অতিক্রম করে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে প্রিয় জনের সঙ্গে মিলনের আবেদন জানায়। এই জনজাতির মধ্যেও আদি সমাজে প্রচলিত বহির্বিবাহ প্রথার প্রচলন দেখা যায়। গানটিতে উল্লেখিত *কুলের বাধা* অর্থাৎ এদের মধ্যে একই গোত্রের মধ্যে বিয়ে হয় না। গানগুলি বিভিন্ন অঙ্গ ভঙ্গির মাধ্যমে বৃত্তাকারে ঘুরে ঘুরে গৃহের উঠনে সারা রাত ধরে হয়। বাদ্যযন্ত্র হিসেবে বাজানো হয় *খাম্বাং* (খোদাই করা কাঠের লম্বা ঢোল), *ছিফুং* (এক ধরনের বাঁশের বাশি), তার যন্ত্র সেরজা, *ওয়া খোলটপ্* (খণ্ডিত বাঁশের চটা),খঞ্জনী *যাপ্ক্রিং* প্রভৃতি।

৫.০ মেচদের বাসগৃহ ও জীবনযাপন :

মেচ জনজাতি তাদের ঘর গুলি বাঁশ, বেত, ছন, ওডলার ছাল ও বিভিন্ন গাছের পাতা দিয়ে তৈরি করে। ঘরগুলি মাটি থেকে দু তিন ফুট উপরে মাচার উপরে করা হয়। শোবার ঘরের পাশে গোলা ঘর থাকে। রান্না ঘর আলাদা ভাবে করা হয়। বাড়ির মেয়েদের জন্য থাকে আলাদা ঘর (নো চা) । মা বাবার শোবার ঘরের পাশে থাকে মেয়েদের থাকার ঘর, বাইরে থাকে ছেলেদের থাকার ঘর। *মাইনৌ* দেবতার থান থাকে শোবার ঘরের পাশে। কৃষিকাজ এদের প্রধান জীবিকা। এছাড়া তারা এণ্ডি পোকার চাষ করত। রান্না করার জন্য প্রধানত জ্বালানি হিসাবে তারা বন থেকে শুকনো

গাছের ডাল পালা কাঠ সংগ্রহ করে। তবে বর্তমানে বিশ্বায়নের প্রভাবে গৃহ তৈরি করার ক্ষেত্রে সে রকম নিয়ম খুব একটা মানা হয় না। উত্তরবঙ্গের প্রকৃতি প্রেমিক মেচদের উপর সর্বপ্রথম আঘাত হানে ইংরেজরা। তারা মেচদের ঝুম চাষের জমিতে চা চাষ করার কথা ভাবে। অরণ্য মাকে ধবংস করে ইংরেজদের চা বাগান তৈরি করার পরিকল্পনা মেচরা মন থেকে মেনে নিতে পারেনি। অথচ সহজ সরল মেচরা এর কোন প্রতিবাদ করতে পারেনি। নেপালিদের কর্ম কুশলতা, সুচতুরতায় এরা ক্রমশ পিছিয়ে পড়েছিল। কোচবিহারের রাজাদের সঙ্গে দ্বন্দ্ব সংঘাত, ইংরেজদের যুদ্ধ, সন্ধি কোনটাই এদের জীবনে খুব একটা প্রভাব পরেনি। একসময় স্যাণ্ডার্স সাহেব নিজে মেচদের চাষবাস ও বাসগৃহের জন্য ৭৬৬ টি মৌজার ২০,৫৯৩.৬৬ একর ব্যবস্থা করে ছিলেন।[১২] ১৮৭৪ সালে চা বাগান তৈরির সময় তাদের সে জমিও হারাতে হয়। এই জনজাতির অবাদ বিচরণ ক্ষেত্র ক্রমশ বন্ধ হয়ে যায়। ঝুমচাষি থেকে তারা রূপান্তরিত হয় স্থায়ী চাষিতে। কার্পাস ও রেশম চাষ করত যে জমিতে সেই জমি চা বাগানের মালিকের হাতে চলে যায়। ইংরেজদের আমলে মিলের তৈরি কাপড় বিদেশ থেকে আসায় এই জনজাতির নিজস্ব তৈরি কপড়ের কদর কমতে থাকে। এমনকি বাঁশ, বেদ, পাট দিয়ে তারা হাতে যে সব জিনিস তৈরি করত সেগুলোরও খুব একটা মূল্য পেত না। এভাবে ক্রমশ তাদের জীবন যাপনে নেমে আসে হতাশার ছায়া।

৬.০ মেচ জনজাতির জন্ম সম্পর্কিত লোকাচার :

প্রাকৃতিক নিয়মে পৃথিবীর সমস্ত মানব সমাজ জন্ম-বিবাহ-মৃত্যু এই তিনটি শব্দের সঙ্গে কোন না কোন ভাবে পরিচিত। হতে পারে তা ভিন্ন ভাষায় ভিন্ন ভাবে। সমস্ত জাতির মানুষের (নিষাদ, কিরাত, ইউরোপয়েড) মধ্যে এই সব অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সংস্কার, বিশ্বাস, রীতিনীতি পালনের মধ্যে কিছু কিছু মিল খুঁজে পাওয়া যায়। পরবর্তি সময় এই সব জনজাতি বিভিন্ন ধর্ম গ্রহণ করলেও নিজেদের অজান্তে এই সব লোকাচার সংস্কার পালন করে। বর্তমানে মেচ জনজাতির মানুষেরা অনেকে খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করলেও তাঁদের নিজস্ব লোকাচার সংস্কৃতি বছরের বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অনুষ্ঠানে পালন করতে আজও দেখা যায়। এই জনজাতির মানুষের কাছে সমাজই শাস্ত্র। জন্ম-বিবাহ-মৃত্যু ইত্যাদি যে কোন অনুষ্ঠানে সমাজের রীতিনীতি মেনে চলতে হয়। সমস্ত লৌকিক আচারে ভূত প্রেত, অপদেবতা, মৃত পুরুষদের আত্মা, গাছপালা, পাথর, মাটি, দেবতা, পশু–পাখি, দেবতা, বিভিন্ন গ্রহ নক্ষত্রের গভীর ভূমিকা রয়েছে। এছাড়া রয়েছে বিভিন্ন জাদু বিশ্বাস, ঝাড়ফুঁক, ওঝা, শুভ অশুভ বোধ ও লৌকিক মন্ত্রতন্ত্র। শুধু জন্ম-বিবাহ-মৃত্যু সংস্কারে নয় জীবনযাপনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তারা শুভ শক্তির জয় ও অশুভ শক্তির পরাজয়ের জন্য এই সব লৌকিক আচার অনুষ্ঠান করে থাকে।

এই জনজাতির মধ্যে কোন রমণী গর্ভবতী হওয়ার পর বিভিন্ন রকম আচার নিয়ম পালন করে। গর্ভাবস্থায় মঙ্গল ও শনিবার বাড়ির বাইরে যেতে দেওয়া হয় না। সন্তান জন্ম না হওয়া অব্দি প্রতি শুক্লপক্ষের তৃতীয়ায় গর্ভবতী রমণীকে বিকেলে স্নান করে ধোয়া কাপড় পরে, জলে আতপ চাল, দুর্বা, তুলসী পাতা মিশিয়ে সবকটি ঘরের চারদিকে উঠোন,*বাথৌ, মাইনৌ* দেবতার থানে জল ছিটিয়ে দিতে হয়। প্রসবের সময় একটি ছামের উপর ভর দিয়ে গর্ভবতী রমণী হাঁটু গেড়ে বসেন। প্রসবের পর তাঁর তল পেটটি ব্যাণ্ডেজের মতো কাপড় দিয়ে জড়িয়ে দেওয়া হয়। সন্তান জন্মানোর জন্য রাভাদের মতোই কোন আলাদা আতুর ঘর তৈরি হয় না। শোবার ঘরই আতুর ঘর হিসেবে ব্যবহার করা হয়। কোন অপদেবতা বা মন্দ আত্মা যেন নবজাতকের ক্ষতি করতে না পারে ও কোন অশুভ দেবতার দৃষ্টি না পরে সে জন্য বালিশের নিচে লোহা বা ছুরি জাতীয় জিনিস রেখে দেওয়া হয়।

রাভা জনজাতির মতো এই জনজাতির মধ্যেও সন্তান প্রসবের সময় গ্রামের কোন বয়স্কা মহিলাকে দাইয়ের কাজ করানোর জন্য ডেকে আনা হয়। সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পর কাচা বাশের তীক্ষ্ণধার চটা দিয়ে শিশুর নাভি কাটা হয়। ছেলে হলে পাঁচ বাড়ে আর মেয়ে হলে ছয় বা সাতবারে কাটা হয়। নাভি কাটার পর জলের মধ্যে তুলসি পাতা দিয়ে ধাত্রী সবার শরীরে জল ছিটিয়ে দিয়ে শুদ্ধ করেন। নাভি কাটার পর নাভির গোড়া তুলো, পাট বা মুগা সিল্কের রশি

দিয়ে বেঁধে তাঁর উপর শুকনো ধুলা বা খড়ের ছাই দিয়ে ভালো করে মেখে দেওয়া হয়। জীবাণুনাশক হিসাবে ব্যবহার করা হয় লোক ঔষধ মৃত মাকড়সার দেহ।[১৩] প্ল্যাসেন্টা বা ফুলটি রাভাদের নিয়মেই ঘরের এক কোণে পুতে রাখা হয়। সন্তানের নামকরণের ক্ষেত্রে তারা দিন ,মাস ও সংখ্যা অনুসরণ করে। সোমবারে জন্ম হলে সে অনুযায়ী তারা নাম রাখে সুম্বারি। প্রথম সন্তান বা একমাত্র সন্তান হলে তারা নাম রাখে 'গট্ছে'। যে মেয়ে বেশি কাঁদে তার নাম হয় রিষ্ঠি বা রেষ্ঠা। নবজাতকের নামকরণের ক্ষেত্রে এই জনজাতির সঙ্গে রাজবংশী সম্প্রদায়ের অনেকটা মিল খুঁজে পাওয়া যায়। রাজবংশীরাও দিন বা মাসের নাম অনুযায়ী নবজাতকের নামকরণ করত। যেমন-ছেলের নাম- সমারু, মেয়ে হলে-সমারি, বুধারু, শুকারু, মংলু, মাসের নামে নাম- ভাদো প্রভৃতি। মেচ জনজাতির নবজাতকের পদবিতে বাবার পদবিই ব্যবহার করা হয়।[১৪] এদের বিভিন্ন পদবি ব্যবহারের ক্ষেত্রে মিথের উল্লেখ পাওয়া যায়। মিথটি এরকম- পৌরাণিক পরশুরামের হাত থেকে আত্ম রক্ষার জন্য তারা যে যেমন ভাবে প্রাণ রক্ষা করে ছিলেন সে অনুযায়ী পুরুষানুক্রমে পদবি ব্যবহার করে আসছেন। যেমন- যারা মাটি খুঁড়ে বসুন্ধরার গর্তে আত্ম গোপন করেছিলেন, তাদের পদবি *বসুমাতারি* । যারা পাট (নার্জি) খেতের মধ্যে লুকিয়েছিলেন তাঁদের পদবি *নার্জিনারি* । যারা হুজৌ বা পাহাড়ে লুকিয়েছিলেন তাদের পদবি হয়েছে *হাজোয়ারি* । যারা জলে আত্মগোপন করে ছিলেন তাঁদের পদবি দৈমারি। ঈশ্বর ভক্তরা যারা গায়ে ছাই মেখে সাধু সেজে আত্মরক্ষা করেছিলেন তাঁদের পদবি*ঈশ্বরারি*।[১৫] এদের ঠাকুর নামেও ডাকা হয়। যারা গভীর বনে মছা বা বাঘ ও ভালুকের সঙ্গে থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন তাঁদের পদবি হয়েছে *মছারি* । এই জনজাতির মধ্যে শিশুদের অন্ন খাওয়ানোর জন্য বিশেষ কোন নিয়ম দেখা যায় না।

৭.০ মেচদের বিবাহ সম্পর্কিত লোকাচার :

বিবাহ মানব জীবনে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। পৃথিবীতে মহাপ্রাণিদের মধ্যে যৌন চাহিদা দেখা গেলেও মানুষ ও প্রাণি জগতের মধ্যে প্রধান পার্থক্য হচ্ছে মানব সমাজে স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে সমাজ স্বীকৃতভাবে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের নিয়ম আছে, যা অন্য কোন প্রাণির মধ্যে নেই।[১৬] বিবাহের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে 'এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকায়' উল্লেখ আছে— *"Marriage may be defined as a physical, legal and moral union between man and woman in complete community of life for the establishment of a family" (Vol-14,p.950)*। পরিবার গঠনের জন্য দুজন নরনারীর নৈতিক, দৈহিক ও বৈধ মিলন বিবাহের মধ্যে দিয়ে সমাজ দ্বারা স্বীকৃত হয়।[১৭] বিয়ের উদ্দেশ্য নিতান্তই কেবল নরনারীর মধ্যে জৈবিক সম্পর্ক স্থাপনই নয়, এই সামাজিক রীতিটি নরনারীর সমগ্র জীবনে দান করে বহুমাত্রা। তাই সমাজবিজ্ঞানীগণ বিয়ের কোন সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা দেন নি। নৃবিজ্ঞানী আর, এম, সরকার বিয়ের তিনটি দিকের কথা বলেছেন, ১. বিবাহ একটি সমাজ-ধর্মীয় অনুষ্ঠান, ২. নরনারীর মধ্যে গভীর সম্পর্ক স্থাপনে বিবাহ একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। ৩. বিয়ের মধ্যে দিয়ে নরনারীর মধ্যে অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও জৈবিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়।[১৮]

জৈব সামাজিক নৃবিজ্ঞানের মতে বিয়ে হলো, *a complex result of genetic and cultural behavior in Homo sapiens.(Greenwood)*[১৯] পৃথিবীতে প্রাচীনকাল থেকে আদিম সমাজে নানা রকম বিবাহ পদ্ধতির প্রচলন দেখা যায়। বিয়ের প্রকারভেদ এরকম- ১. এক বিবাহ (*Monogamy*) ২. দল বিবাহ (*polygyny),* ৩. অন্তর্বিবাহ (*Endogamy*) ৪. অনুলোম বিবাহ (*Hypergamy*), ৫। প্রতিলোম বিবাহ (*Hypogamy*), ৬। বহু বিবাহ (*Polygamy),* ৭। বহু পত্নী বিবাহ *(Polygyny*), ৮। বহুপতি বিবাহ (*Polyandry*) ৯। বহির্বিবাহ (*Exogamy*), ১০। ভাসুর বরণ ১১। দেবর বরণ ১২। অবাধ শ্যালিকা বরণ ১৩। সীমিত শ্যালিকা বরণ (*Restricted)* ১৪। বাঞ্ছিত বিবাহ *(Preferential*), ১৫। মামাতো- ফুপাতো ভাই বোন বিবাহ *(Cross Cousin*), ১৬। দেবর-ভাসুর বরণ (*Lavirate)* ১৭। শ্যালিকা বরণ (sororate) ১৮। চাচাতো বা মামাতো ভাই বোন বিবাহ (*Parallel Cousin)*।

এক বিবাহ পদ্ধতিতে একজন স্ত্রী ও একজন পুরুষের মধ্যে সারা জীবনের জন্য সম্পর্ক স্থাপিত হয়। বিভিন্ন আদিবাসীদের মধ্যে *এক বিবাহ* প্রথা দেখা যায়। *বহুপত্নী* বিয়েতে একজন পুরুষ একাধিক নারীকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করে। *বহুপতি* বিয়েতে কয়েকজন পুরুষ একসঙ্গে একজন নারীকে বিয়ে করে। কোন সমাজে বড়ো ভাই মৃত্যু বরণ করলে ছোটো ভাই তার বৌদিকে বিয়ে করে, এই পদ্ধতিকে বলে *দেবর বরণ*। আবার অনেক সমাজে স্ত্রী মারা গেলে তার ছোটো বোন অর্থাৎ শ্যালিকাকে বিয়ে করা বাধ্যতা মূলক। এই পদ্ধতিকে বলে *শ্যালিকা বরণ*। *বহির্বিবাহ* পদ্ধতিতে কোন ব্যক্তি তার নিজের দলের মধ্যে বিয়ে করতে পারে না। সমগোত্রীয় পুরুষ ও মহিলার মধ্যে নিষিদ্ধ বিয়ের নাম *বহির্বিবাহ*। আবার *অন্তর্বিবাহ* পদ্ধতিতে যে কোন পুরুষ বিয়ের সময় নিজের গোষ্ঠীভূক্ত বা ধর্মীয় সম্প্রদায়ভূক্ত মানুষের মধ্যে বিয়ের সীমাবদ্ধতাকে *অন্তর্বিবাহ* বলে। কোন উচ্চজাতি ও বংশের পুরুষ যখন তার অপেক্ষা নিম্ন জাতির ও বংশের মহিলাকে স্ত্রী হিসাবে গ্রহন করে, তাকে বলা হয় *অনুলোম বিবাহ।* আবার নিচু জাতি ও বংশের পুরুষ তার অপেক্ষা উচু জাতি ও বংশের মহিলাকে স্ত্রী রূপে বরণ করে তখন তাকে বলে *প্রতিলোম বিবাহ*। [২০]

এই জনজাতির মধ্যে নানা রকম বিবাহ রীতি প্রচলিত আছে। বিয়েতে বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গীতেরও প্রচলন দেখা যায়। বিয়ের অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে পাত্র ও কন্যা দুই বাড়িতে রীতি অনুযায়ী নাচ গানের আসর বসে। মেচদের বিয়েতে দুজন বৈরাতী ও দুজন *বাড়িয়ারের* বিশেষ ভুমিকা থাকে। সামাজিক বিয়েতে ছেলে ও মেয়েদের বিয়ের উপযুক্ত বয়স হলে প্রথমে ছেলের বাবা- মা বা অভিভাবক কনের বাড়িতে এসে বিয়ের জন্য প্রস্তাব দেন। এই অনুষ্ঠানের নাম *গাংখোনে হৌনাই*।[২১] প্রয়োজনে ঘটকের (বাঠাক) ভূমিকাও থাকে। কনে পক্ষের পছন্দ হলে শুরু হয় আশীর্বাদের পর্ব। এই অনুষ্ঠানকে বলে *গয়খাওনায়* । দু পক্ষের প্রাথমিক আলোচনা শেষে ছেলে পক্ষ পান সুপারি নিয়ে মেয়ের বাড়িতে যায়। মেয়ের বাড়ির কৌলিক দেবতা *বাথৌ* এর থানে সিজু গাছের নিচে সেগুলি রেখে দেবতার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে। বিভিন্ন শুভ কাজে পান সুপারি মঙ্গল সূচক বলে বিশ্বাস করা হয়। এই জনজাতির মতো রাজবংশী সমাজেও বিয়েতে ও বিভিন্ন পূজানুষ্ঠানে পান সুপারির প্রচলন দেখা যায়। এমনকি *সুবচনী* (রাজবংশীদের লৌকিক দেবতা) দেবতাকে কেবল পান সুপারি দিয়ে পূজা দিতে হয়। মেচ ভাষায় *গৌদান, গৌথার,* বা *জুলি* মানে হল বিয়ের জন্য নির্দিষ্ট করা দিন। বিয়ের আগে বিবাহ মণ্ডপ গোবর জল দিয়ে পবিত্র করা হয়। পুরোহিত (রোজা) সৃষ্টিকর্তার নির্দেশ এবং বিয়ের মন্ত্র উচ্চারণ করে বিয়ের লগ্নপর্বের কাজ শেষ করেন। বিয়ের নিদিষ্ট দিনে *বাথৌ* দেবতার সামনে পূজা দিয়ে বিয়ের কাজ শুরু হয়। *বাথৌ* দেবতার থানের সামনে বর কন্যাকে সামনা সামনি বসিয়ে তাঁদের নামে দুটি মুরগি বলি দিয়ে দেবতাকে উৎসর্গ করা হয়। অনেক সময় শূকরও বলি দেওয়া হয়। *বাথৌ* দেবতার সামনে কলাগাছ পুতে ও আম্রপল্লব দিয়ে সাজানো হয়। পাত্রী কচি কলা গাছের অংশ দিয়ে নিজে হাতে রান্না করা মাংস *'জৌ'* (মদ) সহ বরকে পরিবেশন করে। এরপর নিমন্ত্রিত সকলকে *জৌ* ও মাংস পরিবেশন করা হয়। বিয়ের দিন সারা রাত্রি সকলে মিলে নাচ গানে অংশগ্রহণ করে। পরের দিন পাত্র কন্যাকে নিজের বাড়িতে নিয়ে যায়। বাড়িতে গিয়ে বর বধূ *মাইনৌ* দেবতার থানে আশীর্বাদ প্রার্থনা করে। কলসির জল দিয়ে নব বধূর পা ধুইয়ে দেওয়া হয়। নববধূ একটি জলপূর্ণ কলস পা দিয়ে ভেঙ্গে দেয়। তারপর 'বাথৌ' দেবতার থানে বিবাহিত জীবনে সুখ শান্তি কামনা করে পূজা করা হয়। বিয়ের দুদিন পরে হয় ফুলশয্যার অনুষ্ঠান। সে দিন রাতে লোকজনকে নিমন্ত্রন করে খাবারেরও আয়োজন করা হয়। প্রথমে পাত্রী তার নতুন বরকে ভাত ও মুরগির মাংস পরিবেশন করে, তারপর সকল নিমন্ত্রিতদের খেতে দেওয়া হয়। এই জনজাতির মধ্যে বহু বিবাহ ও বিধবা বিবাহের প্রচলন আছে। এদের মধ্যে ভিন্ন গোত্রের মধ্যে বিয়েতেও কোন বিধি নিষেধ নেই। বর্তমানে অন্যান্য আদিবাসী সম্প্রদায়ের সঙ্গেও এদের বিবাহ হয়ে থাকে। এই জনজাতির মানুষেরা এখন পুরুষ তন্ত্রে বিশ্বাসী। বাবা মার মৃত্যুর পর ছেলেরা সম্পত্তির অধিকারী হয়। বিধবা মায়ের ভরন পোষণের ভার ছেলেরাই বহন করে। এদের মধ্যে ছেলেদের বিয়ের বয়স ১৮-২০ বছর, মেয়েদের ১৬-১৮ বছর। ছেলে মেয়েকে পছন্দ করলে ছেলের মা মেয়ের বাড়িতে গিয়ে মেয়ের বাবাকে সিজু গাছের নিচে

দাঁড়িয়ে এক টাকা দেবেন। এদের জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সিজু গাছ বিশেষ ভূমিকা পালন করে। মাঘ ফাল্গুন মাসের শুষ্ক ও মেঘমুক্ত আকাশে বেশির ভাগ সময় এদের বিয়ের অনুষ্ঠান হয়। কারণ এই সময় আকাশ পরিষ্কার থাকে, খুব একটা ঝড় বৃষ্টি হয় না। এদের মধ্যে শনিবার ও মঙ্গলবার বিয়ে হয়ে থাকে কারণ এই দুটি তাদের কাছে শুভ দিন। জ্যোৎস্না পক্ষে বিয়ের অনুষ্ঠান হলে সংসার জীবন মঙ্গল হয় বলে তারা বিশ্বাস করে এবং এই সময়কে বিয়ের উপযুক্ত সময় বলে ধরে নেওয়া হয়। অন্যান্য সম্প্রদায়ের মত বিয়ের আগে গায়ে হলুদ দেওয়া, অধিবাস বা রঙ খেলার বিশেষ কোন নিয়ম নেই। বিয়ের পরে বাড়ির মহিলারা বাঁশি ও করতালের তালে *মাষাণ্ডি* নৃত্য করে। বিয়ের আট দিন পরে হয় অষ্ট মঙ্গলা । অষ্ট মঙ্গলায় নবদম্পতি কনের বাড়িতে গিয়ে সকলকে প্রণাম করে আশীর্বাদ গ্রহণ করবে ও কয়েকটি নিয়ম পালন করবে। তারপর নিমন্ত্রিতদের নিয়ে শুরু হয় খাওয়া দাওয়ার আয়োজন।

বিয়েতে সুপাত্রী হিসাবে বিবেচিত হয় যারা ভালো সুতো কাটতে পারে (খুন্দুং লু নই), ধান ভানতে পারে (মাই চৌ নি), ভালো অতিথি যত্ন করতে পারে। তবে এখন শিক্ষার দিকটিকেও গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। ছেলেদের মধ্যে যাদের বিষয় সম্পত্তি আছে, যারা ভালো শিকার করতে পারে, অনেক জমিজামা আছে তাদের গুরুত্ব দেওয়া হয়। তবে বর্তমানে চাকুরিজীবি ছেলেদের প্রতি বেশি আগ্রহ দেখা যাচ্ছে। এদের মধ্যে বিভিন্ন রকম বিবাহ রীতি প্রচলিত আছে। যেমন —

ক. *সৌংনান লায়নায়* বা সামাজিক বিয়ে।
খ. *বৌলান লবৌ নানৈ এবা দনিখায় লংনানৈ হাবা* বা বল পূর্বক ধরে নিয়ে এসে বিবাহ।
গ. *খাব সাফনাই বা মেয়ে স্বেচ্ছায়* ছেলের বাড়িতে চলে গিয়ে বিবাহ।
ঘ. *গাবে থানাই* বা ঘর জামাই রেখে বিয়ে দেওয়া।
ঙ. *দীন খাতনাই* – পালিয়ে গিয়ে বিয়ে।[২২]

এই জনজাতির মধ্যে আদিতে কনের বাড়িতে বিয়ের নিয়ম না থাকলেও ,আধুনিক কালে হিন্দু ধর্মের প্রভাবে বিয়ে কনের বাড়িতে *(হিন জাও-গদান)* হয়ে থাকে। এদের মধ্যে কোন পরিবারের বড়ো ভাই মারা গেলে তার স্ত্রীকে ছোটো ভাই বিয়ে করতে পারে। অর্থ্যাৎ এদের মধ্যে *দেবর বরণ* বিয়ের পদ্ধতির প্রচলন আছে । কিন্তু ছোটো ভাইয়ের স্ত্রীকে বড়ো ভাই বিয়ে করতে পারে না। কেউ যদি ছোটো ভাইয়ের স্ত্রীকে বিয়ে করে তাহলে সমাজে কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা আছে। বিয়ের জন্য কোন আলাদা পুরোহিতের প্রয়োজন হয় না। এদের মধ্যে যারা মন্ত্র উচ্চারণ করতে পারে তাকেই বিয়ের জন্য ডাকা হয়। প্রথমে ঈশ্বর বা দেবতার উদ্দেশ্যে মন্ত্রচ্চারণ করা হয়। মন্ত্র গুলি এরূপ -

অহম্ খানাছোং পাঠো রাজা বাঠোয়া
বান্‌দেবা সিজোট-আ গরম বা।[২৩]

অর্থাৎ ওহে ধর্ম দেবতা শিব, ওহে *বাথৌ* দেবতা। তোমরা আমার কথা শোন, তোমরা সবদিক থেকে জগতের মধ্যে পাঁচ দেবতার সমতুল্য। এভাবে মন্ত্র উচ্চারণের মধ্যে দিয়ে কুল দেবতাকে সন্তুষ্ট রাখার চেষ্টা করে যাতে বিয়েতে কোন অমঙ্গল ঘটনা না ঘটে।

৭.১ মেচদের কয়েকটি বিয়ের গান :

মেচদের বিয়ের গানগুলি সমবেত ভাবে গাওয়া হয়। গানের সঙ্গে সঙ্গে নৃত্যও চলে। গানগুলি এতটাই আবেগ দিয়ে গাওয়া হয় যা হৃদয়স্পর্শী। এঁরা বিয়েকে বলে *হাবা গৌদান জুলি* । বিয়ের গান গুলিকে বলা হয় *হাবা মেথায়* । গান গুলি বিয়েতে ও বৌভাতের অনুষ্ঠানে গাওয়া হয়। গান গুলির মধ্যে দিয়ে পাত্র কন্যা দু পক্ষের আত্মীয়রা নির্মল রঙ্গ কৌতুকের মধ্যে দিয়ে আনন্দ উপভোগ করে। তাঁদের বিয়ের গান গুলি নিম্নরূপ—

ওই শিয়ালী শিয়ালী
হারা জেংলাবনি বৈরাতী

নউং নঙাব্লা হাবা জায়া নৈ
আবৈ- জায়া লৈ।
হাবা জানায়নি, খেরায় জানায়নি
ডায় ফাইতয়া বোহা থাং খৈ লৈ
আবৈ বোহায় থাংখৈ লৈ।।
নীং থাঙাব্লা নৌং কেয়া ব্লা
হাবা মানষিফ্রা দুখু মৌনৌ লৈ
আবৈ দুখু মৌনৌ লৈ
ওই শিয়ালী শিয়ালী।।[২৪]

বাংলায় ভাবানুবাদ:

ওগো বৈরাতী শিয়ালী
তুমি সবার বিয়েতে এয়োর কাজ কর
তুমি না এলে, তুমি না আসলে
বিয়ের উৎসব যে জাকজমক হয় না।।
বিয়ের ভোজের পান সুপারি
খিরাই পূজার পান সুপারি
কোথায় রাখলে ?
বিয়ের অনুষ্ঠানে তুমি না থাকলে
সবার মন বেদনায় ভরে যায় ।।

এই জনজাতির মধ্যে বিয়ের সময় বৈরাতী বিশেষ ভূমিকা পালন করে। বৈরাতীরা হয় নাচে গানে হাসি মশকরায় রসিক প্রকৃতির মানুষ। তারা বিয়ের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে। বর ও কন্যা পক্ষের আত্মীয়রা বৈরাতীকে নিয়ে বিভিন্ন হাস্য রসাত্মক গান গেয়ে আনন্দ উপভোগ করে। এদের সমাজে সামাজিক নিয়মে স্ত্রী পুরুষের মিলন যে খুবই আনন্দের বিষয় তা বিয়ের গানগুলির মধ্যে দিয়ে বোঝা যায়। পাত্রীকে স্নান করানোর জন্য জল আনা হয় নদী থেকে। সে উপলক্ষ্যে তাঁদের গান এরকম-

দৈখাও দৈখাও অহল্যা সতী
সোনালি দৈহুবা গৌজাও লাংখৌন
গঙ্গা যমুনানি দৈ জৌং
দিনে কৃষ্ণা খা থু খৈনাং গৌ
থু খৈ নানৈ জৌংহা দিনৈ
কাটিধারা বা জা হৈনা গৌ।।

বাংলায় ভাবানুবাদ:

জল তোল তোল অহল্যা সতী
না হলে সোনার কলসী ভেসে যাবে গঙ্গা যমুনার জলে
ভালো করে জল তোল হে।

গঙ্গা যমুনার জলে আজ স্নান করাতে হবে কৃষ্ণাকে ।।

এই জনজাতির মানুষেরা যেমন বন জঙ্গলে বিভিন্ন পশু পাখি, প্রকৃতিকে ভালবাসত, তেমনি এদের সঙ্গে ঘনিষ্ট যোগ ছিল বিভিন্ন নদ নদীর। নদ নদীকে তারা দেবতা জ্ঞানে পূজা করে। নদীর জলকে তারা অত্যন্ত পবিত্র বলে মনে করত। বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠানে ও বিয়েতে নদীর জলের ব্যবহার দেখা যায়। সুন্দর ও সুস্থ ভাবে জীবন ধারণের ক্ষেত্রে তারা নদীর গুরুত্ব উপলব্ধি করেছে। তাই তাঁদের বিভিন্ন লোকাচারে ও গানে নদ নদীর প্রসঙ্গ এসেছে।

বিয়ের সময় নতুন বর কন্যার মঙ্গল কামনা করে বিভিন্ন ধরনের গান গাওয়া হতো। যেমন—

ফাগুন নোখাফর-নি মজাং দিনাও
আর জুরি যদিং আব নাংহা দনই,
জংয়ো লাব্দং বিবারণি মালা খৌ সুনানে।
নোং জান্‌দো আবো জোংখৌ আন্‌না নৌই
ফৈদৌ হায় ফৈদৌ আবো আংসুলি মাইনাও
ফানৌ নাংসে নোংলায় বে ফথারাউ
গজন সুডেম মন্‌বাই জংহা বন্নি বোউ
মন্‌ - নাও ফাদং গোন্‌ নৌং জেব্‌লাবৌ জোংলি বৌ না আও ।।

বাংলায় অনুবাদ:

ফাল্গুন মাসের জ্যোৎস্না রাত্রিতে তোমরা বিয়ে করতে যাচ্ছ,
তোমাদের জন্য সুন্দর সুন্দর ফুল তুলে দিচ্ছি
তোমাদের গলায় সুন্দর সুন্দর ফুল গুলি শোভা পাক
লক্ষ্মী বোন তোমার শান্তি ও সুখময় জীবন কামনা করি।

বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর বিবাহ বাসরে দাদু দিদারা বর কনেকে আগামি দিনে সংসার করার বিষয়ে কিছু উপদেশ দিয়ে আশীর্বাদ জানায়। বর কনেকে বিয়ের মণ্ডপের চারদিকে সাতবার ঘুরিয়ে ঘরে নিয়ে যায় সেইসঙ্গে চলে নৃত্য গীত। এই সময়ের একটি গান নিম্নরূপ—

হবাবার আবৈ সোনা
হবাবার আবৈ সোনা
রাইজৌ খৌ মৌজাইয়ে যা
হোয়ানি নবোয়ানৌ নৌংনি নবো আবৈ
পিসাইনি নবোয়ানী নৌংনি নবোখর
পিসাইনি সমাজৌং বাখলাই জা
সোংসারনি মানষি জৌং দা -মুগৈয়া।

বাংলায় ভাবানুবাদ:

ওগো দাদু ভাই ওগো দিদা ভাই

ভালো করে তোমরা সংসার করো
সংসারে বাবা মায়ের সুনাম অর্জন করো
আমাদের চেয়েও তোমরা ভালো করে
সংসার করো।

স্বামীর গৃহে যাওয়ার সময় কনের বাড়ির দাদা দিদিরা বিদায় বেলায় গান গেয়ে ছোটো বোনের মঙ্গল কামনা করে। কন্যা বিদায় পর্বের গান এরকম-

দাগা চৈই আগেই বিনানাও কঙ্গাল
হোয়ানি হর কাকেই হারসা হোয়ানা
হরকাকেই বড়ো হোয়াজৌং রাইজা
জানৌচৌ হরদৌং আগেই হরদৌং
সোনাদৌন নাইকৌ লাংকাপা
জি দৌনি নাইকৌ লাকাপা
গৌরালাই গৌসৌনি আগল আখুনি
ছৌ লৌন্তিফী রকৌ
বাওলাংদৌ আগেই।[২৫]

বাংলায় ভাবানুবাদ:

কেঁদো না বোন তুমি
অন্য কোন জাতির ছেলের সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়নি।
একটা যুবক ছেলের সঙ্গে সংসার করার জন্য তোমাকে বিয়ে দেওয়া হয়েছে।
তোমার জন্য গড়া সোনা ও কাপড় সঙ্গে করে নিয়ে যাও
ছোট শিশুর মনের কথা ভুলে যাও গিয়ে।

এই ভাবে মেচ জনজাতির বিয়েতে বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠানে ও গানে আদিম সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন প্রকার বিবাহ পদ্ধতির *(বহু বিবাহ, বহির্বিবাহ, অন্তর্বিবাহ, দেবর বরণ)* ব্যবহার দেখা যায়।

৮.০ মেচ জনজাতির মৃত্যু সম্পর্কিত লোকাচার :

এই জনজাতির মধ্যে কারো মৃত্যু হলে বিভিন্ন রকম লৌকিক আচার পালন করে থাকে। মৃতদেহ কবরদান এদের আদি প্রথা হলেও বর্তমানে হিন্দু মেচ বা চম্প্রমারি গোত্রের লোকেরা ছাড়া বাকি সবাই মৃতদেহ দাহ করে। মৃত্যুর পর মৃতদেহ দক্ষিণদিকে মাথা করে রাখা হয়। কারণ তারা বিশ্বাস করে এতে করে মৃত ব্যক্তির আত্মা সহজেই কৈলাস পর্বতে যেতে পারবে। মৃত ব্যক্তিকে শ্মশানে বহন করে নিয়ে যাওয়ার জন্য তার সমগোত্রীয় লোকের প্রয়োজন হয়। মৃতের পরিবার ৯/১১/১৩ দিন অশৌচ পালন করার পর শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করে।[২৬] এই সময় তারা নিরামিষ আহার করে। শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের দিন তারা ঘরে তৈরি মদ ও মুরগি বলি দিয়ে শ্রাদ্ধের কাজ শেষ করে। তারপর নিমন্ত্রিতদের জন্য ভোজের আয়োজন করে। অশৌচ পালনের সময় মৃত ব্যক্তির ছেলেরা সেলাই ছাড়া সাদা কাপড়ের থান ব্যবহার করে। দিনের বেলা মারা গেলে রাত হওয়ার আগে মৃতদেহ দাহ বা কবর দেওয়া হয়। রাতে মারা গেলে পরের দিনের মধ্যে সমাধি দেওয়া হয়। মৃত্যুকে তারা স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক নিয়ম বলেই মনে করে। তাই তাঁদের মধ্যে খুব একটা শোক

তাপের ব্যপার নেই। মৃতদেহ দাহ বা কবরের জন্য কোন নিদিষ্ট স্থান নেই। মৃত ব্যক্তির নিজস্ব জমিতে কবর বা দাহ করা হয়। মৃত ব্যক্তিকে শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার পর বাড়ির মহিলারা বাড়ির উঠোনে ঘরে গোবর জল ছিটিয়ে বাড়ি শুদ্ধ করেন। কবর দেওয়ার সময় মৃতদেহের মাথা দক্ষিণদিকে করে রাখা হয় ও কবরে কিছু টাকা ও কড়ি দেওয়া হয়। সারা দেহ সাদা কাপড়ে ঢাকা থাকে। কবরে মাটি চাপা দেওয়ার আগে মৃত ব্যক্তির নাক বরাবর একটি সরু গর্ত রাখা হয় যাতে মৃতের আত্মা নিশ্বাস নিতে পারে। মৃতের আত্মা একসময় ফিরে আসবে বলে তারা বিশ্বাস করে। তখন যেন নিশ্বাস নিতে অসুবিধা না হয় সে জন্য তারা এই রীতি পালন করে। এমনকি মৃতের আত্মার তৃষ্ণা নিবারনের জন্য একটি জল ভরা কলসি রাখা হয়। তাঁদের শ্রাদ্ধ শান্তি অনেকটা হিন্দু রীতির অনুসারী। দাহ স্থান থেকে ফিরে এসে তারা বাড়ির উঠোনে মাটি দিয়ে একটা ঢিবি করে বাঁশের ঝুড়ি দিয়ে ঢেকে রাখে। প্রতিদিন সেখানে (শ্রাদ্ধ না হওয়া অব্দি) খাওয়ার ও জল দেওয়া হয়। মৃতের আত্মা সেখানে খেতে আসে বলে তারা বিশ্বাস করে। শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের আগে মৃতের ছেলের মাথা কামিয়ে ফেলতে হয়। মৃতদেহ সৎকারের দিন তারা *মৈব-বার-চাঙ্গি* নামে এক ধরনের নৃত্য পরিবেশন করে। এই নৃত্যে *হ্যাম, 'কালবংশী', 'দাবদি', 'ডাংসী'* প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র বাজায়। শবদেহ যারা বহন করে নিয়ে যায় তাঁদের বলে *গোথোই বাঙ্‌রা* ।[২৭] শবদেহ সৎকার করার স্থানকে বলা হয় *গোথোই হাকার* । শিশুদের মৃতদেহ সমাহিত করা হয়। অপমৃত্যু মরাকে তারা কবর দেয়। কোন পরিবারের গরু বাঘে খেলে রোজাকে ডেকে নিয়ে এসে *বাথৌ* পূজা করা হয়।

শ্রাদ্ধের দিন আত্মীয়দের আমন্ত্রন জানানো হয়। প্রত্যেকে চাল, ডাল, কিছু *'জৌ'* নিয়ে শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠানে আসে। মৃতের সন্তানেরা ও আত্মীয়রা মোরগের মাংস ও ভাত রান্না করে কবর বা দাহ স্থানে নিয়ে গিয়ে মৃতের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করে। তার পর তারা উচ্চারণ করে—

দলোই নঞআ মাছৌ দন্না
নোংসি গুণোই দনোই,
আই আফা দৈজুব্বায়।
নংনি জানায় লংনায় খ্যুম জব্বায়।
বিখৌ জানা – নৈ নং থাংদো।
দনোই নিফ্রা নংজংনি মানষী অংল্যায়া
গাও গোপাল, গাও জাবাই থাই-দো।
নং দনোই নি ফ্রা কোন বাইদি দাসিগি
কৈ ছৈ ।[২৮]

বাংলায় ভাবানুবাদ:

তোমার শ্রাদ্ধের দিনে সকলে মিলে আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছি। তোমার জন্য জল ও খাওয়ার নিয়ে এসেছি। আজ থেকে তোমাকে আর আমরা পাবো না। তোমাকে দেওয়া খাওয়ার গুলি আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ কর। তুমি আর আমাদের ভয় দেখাতে আসবে না। এই জনজাতির লোকেরা মৃত্যুর পরেও আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাসী। তারা মনে করেন আত্মা অবিনশ্বর, কোন ব্যক্তির মৃত্যুর পর আত্মা এক দেহ থেকে অন্য দেহ ধারণ করে।

তারা ভোজসভায় যে সব খাওয়ারের আয়োজন করে সেগুলি চম্প্রমারী গোত্রের কোন একজনকে দিয়ে স্পর্শ করে শুদ্ধ করে নেয়। তারপর সকলে খাওয়া দাওয়া শুরু করে। তারা আত্মার পুনর্জন্মে বিশ্বাসী। তবে জীবিত অবস্থায় ভালো মন্দ কর্মের উপর তা নির্ভর করে। ভালো লোকের আত্মা পুনরায় মানুষ ও পাপ কাজ করলে বিভিন্ন পশুতে

জন্ম নেয়। সমাজে যারা অসামাজিক কাজ করে মৃত্যুর পর তাঁদের আত্মাই বিভিন্ন অপদেবতার রূপ নেয় বলে মনে করেন। এই ভাবেই এই জনজাতির মানুষেরা মৃত্যু সম্পর্কিত নানা লৌকিক বিশ্বাস ও আচার আচরন পালন করেন।

৯.০ টীকা ও সূত্রর্নিদেশ:

১. ঈশ্বরারী, দ্বরেন্দ্র, *মেচ জীবন ও সংস্কৃতি* , *জলপাইগুড়ি জেলা সংখ্যা*, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, কলকাতা, ১৪০৮ (বাং) পৃ. ১৬৯

২. Chatterji, Suniti Kumar, *Kirata Jana Krti* ,The Asiatic Society, park street, Kolkata,1951, p. 45

৩. ঈশ্বরারী, দ্বারেন্দ্র, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭০

৪. ঈশ্বরারী, দ্বারেন্দ্র, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭০

৫. **নরেশ চম্প্রমারি**

বয়স— ৫৮/৫৯ বৎসর। গ্রাম- মধ্য ছেকামারি, মাদারিহাট, আলিপুরদুয়ার। পেশা-কৃষিকাজ, অল্প শিক্ষিত । মেচ জনজাতির বিভিন্ন পেশা, লৌকিক আচার, প্রথাগত পোশাক খাদ্য, মৃত্যু সম্পর্কিত লোকাচার বিষয়ে জানতে পারি। ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে ২৭.১০.২০১৫ তারিখে তা সংগৃহিত হয়েছে।

৬. চক্রবর্তী, সমীর, *চা- বলয়ের সংস্কৃতি,* লোক সংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ,ঢাকুরিয়া, কলকাতা, জানুয়ারী ২০১০, পৃ. ২১১

৭. চক্রবর্তী, সমীর, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬

৮. দেব, রণজিৎ, *উত্তরবঙ্গের উপজাতির ইতিবৃত্ত,* মেইনস্ট্রীম পাবলিকেশন, কলকাতা, বইমেলা, ২০১৪

৯. **নরেন চম্প্রমারি**

বয়স- ৬৫ বৎসর, গ্রাম- ছেকামারি, মাদারিহাট, আলিপুরদুয়ার। পেশা- কৃষিকাজ, অল্পশিক্ষিত। মেচদের গোত্র পরিচয়, গোত্র ভেদে বিভিন্ন বিধিনিষেধ পালন ও ঝুম চাষ সম্পর্কে জানতে পারি। তথ্য গুলি ২৮.১০.২০১৫ তারিখে সংগৃহিত হয়েছে।

১০. পাল, সুনীল, জলপাইগুড়ি জেলার বর্ণময় লোকসংস্কৃতি নৃত্য ও গীত, *জলপাইগুড়ি জেলা সংখ্যা* ,তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, কলকাতা, ১৪০৮ বাং. পৃ. ১৮৬

১১. **মহেশ নার্জেনারি**

বয়স- ৭০/৭১ বৎসর। গ্রাম- উত্তর ছেকামারি, মাদারিহাট, আলিপুরদুয়ার। পেশা- বিদ্যালয়ের শিক্ষাকর্মী ছিলেন। বোডো সাহিত্য সংস্কৃতি চর্চার সঙ্গে যুক্ত। মেচ ভাষায় তিনি বিভিন্ন গান লেখেন। মেচ ভাষায় তিনি মুখে মুখে কয়েকটি বাগুরুম্বা নৃত্যের গান বলেছিলেন। *বাগুরুম্বা* নৃত্যের পঞ্চ তাল সম্পর্কেও আলোকপাত করেন। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তিনি নিজেও *বাগুরুম্বা* নৃত্য পরিবেশন করেন। তাঁর কাছ থেকে ২৬.১০. ২০১৫ তারিখে সংগৃহিত হয়েছে।

১২. দেব, রণজিৎ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৭

১৩. চক্রবর্তী,সমীর, পূর্বোক্ত,পৃ. ৬৫

১৪. **সাবিত্রী বসুমাতা**

বয়স- ৬৭/৬৮ বতসর। গ্রাম- পূর্ব ছেকামারি, মাদারিহাট, আলিপুরদুয়ার। পেশা- গৃহের কাজ। অল্পশিক্ষিত। মেচদের জন্ম সম্পর্কিত বিভিন্ন লোকাচার ২০.১০.২০১৫ তারিখে তার কাছ থেকে সংগৃহিত হয়েছে। নবজাতকের নামকরণের খুঁটিনাটি বিষয় সম্পর্কে জানা যায়।

১৫. **মন্মথনাথ শৈব**

বয়স- ৭০/৭১ বৎসর। পেশা- বিভিন্ন সাহিত্য চর্চার সঙ্গে যুক্ত। গ্রাম- মাদারিহাট, আলিপুরদুয়ার। মেচদের নামকরণ পদ্ধতি, বিভিন্ন পদবির নামকরণের লৌকিক কাহিনি গুলি তাঁর কাছ থেকে সংগৃহিত হয়েছে।

১৬. ইসলাম, এ কে এম আমিনুল, *এই পৃথিবীর মানুষ,* ২য় খণ্ড ,বাংলা একাডেমী, ১৮৮৯,পৃ. ৪২

১৭. আহমদ, ওয়াকিল, *বাংলার লোকসংস্কৃতি,* বাংলা একাডেমী, ১৯৭৪,পৃ. ১৭২

১৮. সরকার, আর, এম, *নৃবিজ্ঞান পরিচয়,* ২য় খণ্ড, কলকাতা, ১৯৯৭, পৃ. ১৯১

১৯. সরকার, আর, এম, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯২

২০. হক, নাজমুল, *উত্তরবঙ্গের লোকসাহিত্যের নৃতাত্ত্বিক ও সমাজ তাত্ত্বিক সমীক্ষা,* বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ১৭৩-১৭৮

২১. দেব, রণজিৎ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৫

২২. চক্রবর্তী, সমীর, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৯

২৩. দেব, রণজিৎ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৭

২৪. **স্বপ্না শৈব**

বয়স- ৫৫/৫৬ বৎসর। পেশা- গৃহকাজ, অল্প শিক্ষিত,বিবাহিতা। গ্রাম- শালকুমার, ফালাকাটা, আলিপুরদুয়ার। পিতার বাড়ি- মাটিগাড়া, শিলিগুড়ি। তাঁর কাছ থেকে মেচ জনজাতির বিয়ের বিভিন্ন লোকাচার ও গান সংগৃহীত হয়েছে। বিয়ের পর তিনি স্বামীর পদবি গ্রহন করেছেন। তথ্য সংগ্রহের তারিখ- ৫.১১.২০১৫

২৫. **মাশান কার্জী**

বয়স- ৭৯/৮০ বৎসর। পেশা- মেচ সংস্কৃতির লোকশিল্পী,অল্পশিক্ষিত । মেচদের বিভিন্ন লোক অনুষ্ঠানে গান ও নৃত্য পরিবেশন করতেন। গ্রাম- মেন্দাবাড়ি, হেমিল্টনগঞ্জ, আলিপুর দুয়ার। তার কাছ থেকে বাগুরুম্বা নৃত্যের গান ও কিছু বিয়ের গান সংগ্রহ করা হয়েছে। মেচদের বিয়েতে প্রয়োজনীয় *জৌ* কি ভাবে তৈরি করা হয়, সেই পদ্ধতি তাঁর কাছ থেকে জানা যায়। সংগ্রহের তারিখ- ২৭.২.২০১৬

২৬. **জীবন শৈব**

বয়স-৫৬/৫৭ বৎসর। পেশা-কৃষিকাজ। গ্রাম-উত্তর ছেকামারি, মাদারীহাট,আলিপুরদুয়ার। এই জনজাতির মৃত্যু সম্পর্কিত বিভিন্ন নিয়ম রীতি তার কাছ থেকে জানা যায়। সংগ্রহের তারিখ- ২৬.১০.২০১৫

২৭. **মহাদেব কার্জী**

বয়স— ৪৫/৪৬ বৎসর। পেশা- কৃষিকাজ। গ্রাম- নর্থ খয়েরবাড়ি, মাদারীহাট, আলিপুরদুয়ার। মৃত্যুর সময় বিভিন্ন অশৌচ পালনের নিয়ম, লোকবাদ্যের ব্যবহার, তাঁদের নাম সেই সব বাদ্যের ব্যবহার সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়। তথ্য সংগ্রহের তারিখ- ২৬.১০.২০১৫

২৮. দেব, রণজিৎ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮২